The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.133 -146)
Published in October, 2025

বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঋক্-বৈদিক যুগের সামাজিক অবলোকন

ড. লিটন মিত্র *

প্রতিপাদ্যসার: নদীর উৎপত্তিস্থল সাগর হলেও সে কখনো উৎসে সীমাবদ্ধ নয়; কালের স্রোতে নদী উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে চলে আসে। আর নদীর প্রবহমান কাল ভাটি-উজানের খেলায় মেতে থাকে। ভাটির সময়ে প্রবাহিত নদী উজানের খবর জানে না। নদীর মতোই যুগও সময়ের স্রোতে ধাবমান। বর্তমান যে যুগে আমরা বসবাস করছি পূর্বেও ঠিক এমন ছিল তা নয়; আবার সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে তা ভবিষ্যতেও ভিন্ন রূপ ধারণ করবে। কিন্তু সাহিত্য একটা অনেক বড় মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে কালকে তথা যুগকে স্পর্শ করা যায়। এ যেন ঠিক বর্তমান প্রজন্ম যেমন বাবা-মায়ের কাছ থেকে গল্প শুনে পুর্ব-পুরুষদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করে, চেনার চেষ্টা করে; একইভাবে এ যুগে বসেও সাহিত্যের মাধ্যমে অবলোকন করা যায় পূর্বের যুগকে। ঋগ্বেদ হচ্ছে মানব ইতিহাসের প্রথম প্রামাণ্য সাহিত্য। ভারতবর্ষ এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী তথা সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের প্রামাণ্য সাহিত্য। এ কারণে এ যুগে বসে ঋক্-বৈদিক যুগের সমাজ সম্পর্কে জানতে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ঋগ্বেদের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।]

ভূমিকা

বর্তমান যুগে আমরা যারা বসবাস করছি তারা চাইলেও হাজার হাজার বছর পূর্বের সময়টাকে স্পর্শ করতে পারি না। সে সময়ের মানুষ কেমন ছিল, তাদের বাসস্থান, খাবার, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, নারীদের অবস্থান, আইনকানুন, রুচি তথা জীবনবোধ সহ সবকিছু সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল থাকলেও তা নিবৃত্ত করার কোনো উপায় থাকে না। তবে সাহিত্যের মাধ্যমে সে যুগের সময়টায় অবলোকন করতে পারি। আলোচ্য প্রবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে প্রামাণ্য গ্রন্থ ঋগ্বেদের আলোকে সে সময়টাকে স্পর্শ করতে; সে যুগের মানুষের জীবনাচরণ সম্পর্কে জানতে।

ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর একটি শাখা ইরানের মধ্য দিয়ে ভারতে এসেছিল। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্থে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ইরান থেকে ভারতে এসে বসতি স্থাপন করে। গবেষকদের মতে এরাই বৈদিক-আর্য বলে পরিচিতি লাভ করে এবং পরবর্তীকালে অনার্যদের সাথে মিশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ভারতবর্ষের আর্যদের প্রাচীন এবং জনপ্রিয় সাহিত্য বৈদিক সাহিত্য। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের যে সুবিশাল সাহিত্যের ভাণ্ডার আছে, তা-ই হচ্ছে বৈদিক সাহিত্য। আর বেদের এই বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার কেবল ভারতবর্ষে নয়; বরং বিশ্ব ঐতিহ্যের দিক থেকে এক দীপ্তময় যুগের সূত্রপাত ঘটায়। ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১৫০০ শতাব্দীর মধ্যে। *বেদ* শব্দটি এসেছে *বিদ্* ধাতু থেকে। শব্দটির বুৎপত্তি হচ্ছে বিদ+অচ্=বেদ। *বিদ্* শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান।

বেদকে শ্রুতি, ত্রয়ী, আগম, ছন্দস্ নামেও অভিহিত করা হয়। পরমপুরুষ থেকে বেদ সৃষ্ট বলে মীমাংসা দর্শন ও বেদান্ত দর্শনে বেদকে অপৌরুষেয়ও বলা হয়। এজন্য অনেকের মতে, যে গ্রন্থ থেকে পরম জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করা যায়, তা-ই *বেদ*।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বৈদিক সাহিত্য প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত– মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্ –

১. মন্ত্র (সংহিতা) ও

২. ব্রাহ্মণ

তবে পরবর্তীকালে *আরণ্যক* ও *উপনিষদ* নামে আরো দুটো অংশ বৈদিক সাহিত্যে যুক্ত হয়।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদানের দ্বারা ধারণা পাওয়া যায় সে যুগের সামাজিক জীবনপ্রণালি, জাতিভেদ প্রথা, অনুশাসন, শিক্ষা, সংস্কার, নারীদের অবস্থান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে। নিম্নে বৈদিক যুগের সামাজিক জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথাঃ

বর্তমান যুগে আমরা প্রতিনিয়ত বর্ণ ও জাতিপ্রথাকে কেন্দ্র করে সমাজে বৈষম্যের স্বীকার হয়ে থাকি। সমাজে কিছু মানুষকে উচ্চ আসনে আসীন করতেই এই বর্ণ ও জাতিপ্রথার সৃষ্টি বলে ধারণা করা যায়। তবে তা কেবল বর্তমানেই সৃষ্ট হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। পূর্ব হতেই এই ভেদ চলে আসছে। প্রামাণ্য গ্রন্থ ঋগ্বেদের আশ্রয় নিলে দেখা যায়, সেসময় থেকেই বর্ণপ্রথা ছিল তবে তা বর্তমানের মতো নয়।

ভারতবর্ষে আর্যরা যখন প্রথম আসেন তখন তাঁরা দলবদ্ধভাবে বাস করতেন এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। কালক্রমে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে অনার্যদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তাই এদিক থেকে বিচার করলে সমাজে দুটো শ্রেণি দৃশ্যমান ছিল– ১. আর্য ও ২. অনার্য। ৩/৫৩/১৪-এ যেমন 'নৈচাশাখং' অর্থাৎ নীচ বংশীয়দের উল্লেখ আছে আবার ৩/৩৪/৯ এ 'হত্বী দস্যূন্ প্রার্যং বর্ণমাবৎ' অর্থাৎ আর্যদের দস্যুদের কাছ থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আরো স্পষ্টভাবে এ দুটি জাতির উল্লেখ রয়েছে ১০/১০২/৩-এ (যেমনঃ দাসস্য বা মঘবন্নার্যস্য বা)।

ঋগ্বেদের বহু স্থলে 'বর্ণ' শব্দটি রয়েছে। তবে বর্ণ শব্দটি 'রঙ্' বা 'আলো' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট পণ্ডিতব্যক্তি রামশরণ শর্মা বলেন–

> খ্রি. পূ. ১৫০০–১০০০ অব্দের মধ্যবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাসকারীদের দৈহিক আকৃতির কিছু উল্লেখ ঋক্‌বেদে আছে। গায়ের রঙকে এ যুগে বলা হত বর্ণ। অনুমান করা হয় যে, ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীরা ছিল গৌরবর্ণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের গায়ের রং ছিল কালো। এই বর্ণবৈষম্য হয়তো আংশিকভাবে সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিয়েছিল (শর্মা ১১৯)।

ঋক্-বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে–

> ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী-দ্বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
> ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।। (দত্ত ৫৭০)।

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা পরমপুরুষের মুখ ব্রাহ্মণে পরিণত হলো, দুই বাহু হলো রাজন্য, যা ঊরু ছিল তা বৈশ্য হলো, দুই চরণ থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে।

ড. যোগীরাজ বসু বর্ণপ্রথা প্রসঙ্গে বলেন–

> ঋকসংহিতার অন্যান্য মণ্ডলে 'বিশঃ' শব্দ আছে, বৈশ্য শব্দ পাওয়া যায় না। 'বিশঃ' কথাটির অর্থ সাধারণ প্রজা। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে ঋক্ সংহিতার দশম মণ্ডল ব্যতীত পূর্ব পূর্ব মণ্ডলে চতুর বর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না কিন্তু এই মত ভ্রান্ত, কারণ চারিবর্ণের কথা পাওয়া না গেলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ মণ্ডলের বৃহস্পতি সূক্তের অষ্টম ঋক্ উদ্ধৃত করা চলে।,–

'তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমন্তে
যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি।'–(৪/৫০/৮)

অর্থাৎ সেই রাজার বিশগণ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অনুগত হন যে রাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে (সর্বকর্মে) অগ্রবর্তী রাখেন। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বিশের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে (বসু ২২০)।

৯/১১২ নং সূক্ত হতে বলা যায়, তৎকালীন সমাজের এই বর্ণপ্রথা বংশানুক্রমিক ছিল না, ছিল বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক। ব্রাহ্মণেরা বেদ পঠন-পাঠন ও চর্চা করতেন বলে অধ্যয়নই ছিল তাঁদের পেশা, ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি ছিল যুদ্ধ করা ও জনসমষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বৈশ্যরা পশুপালন ও কৃষিকাজ করে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতেন এবং শূদ্র উচ্চতর বর্ণের শুশ্রূষায় নিয়োজিত ছিলেন। বৈদিক যুগের এ ব্যবস্থা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমানের রূপ ধারণ করেছে। এখন আর পেশাভিত্তিক বর্ণ-ব্যবস্থা নেই। ক্ষত্রিয়রা যে রাজা হতেন তা বোঝা যায় ৪/৪/১-এ। ৫/৩৪/৭, ১/১১২/১১ এবং ৫/৪৫/৬-এ বৈশ্য বা বণিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে দাস অর্থে শূদ্রের ব্যবহার হয়েছে ৪/২০/৪-এ।

পারিবারিক জীবন:

পরিবারতন্ত্র ঋক্-বৈদিক যুগ থেকেই বিদ্যমান। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তের আলোচনায় পরিবার এবং পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত অর্থাৎ *অগ্নি* সূক্তে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নিয়ে বলা হয়েছে–

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।। (দত্ত ৮১)।

অর্থাৎ পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি! তুমি আমাদের নিকট সেরূপ হও; মঙ্গলার্থ আমাদের নিকটে বাস কর।

এখানে পিতা-পুত্রের মধ্যে যে সহজ-স্নিগ্ধ-মধুর সম্পর্ক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আর এই সম্পর্কের মতো অগ্নির সাথে সেরূপ সম্পর্ক স্থাপনের প্রার্থনা করা হচ্ছে।

ঋক্-বৈদিক যুগে 'পরিবার' বা 'কুল' শব্দের ব্যবহার তেমন না পাওয়া গেলেও 'গৃহ' শব্দের প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়। কেবল পিতা-মাতা, সন্তান, দাসদাসী নিয়ে পরিবার ছিল না; বরং যৌথ পরিবারের প্রাধান্য ছিল।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (কুল) ছিল বলে স্বভাবতই পিতার গুরুত্ব বেশি ছিল। পরিবারের প্রধান পুরুষকে বলা হতো গৃহপতি বা কুলপ। ঋক্-বৈদিক যুগে কন্যাসন্তানের জন্মের জন্য কোনো কামনা প্রকাশ না করলেও বীরপুত্রসন্তান লাভের প্রতি আগ্রহ ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন, বীর পুত্র যুদ্ধে পারদর্শী হলে গৃহ তথা কৌমসমাজের রক্ষক হতে পারবে। সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে পুত্রেরই অগ্রাধিকার ছিল। পুত্র না থাকলে ঔরসজাত দুহিতা পৈতৃক ধন পেতো (৩/৩১/১-২)। এসময় পিতার পিতাকে পিতামহ, পুত্র বোঝাতে তান্ব, শেষঃ এবং সূনু; পৌত্র বোঝাতে নঃ ও নপত্রী প্রভৃতি বিশেষ পরিভাষা ছাড়াও ভার্যা, ভগিনী, মাতুল, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর (দেবৃ) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া সমান গোত্র, সমানজন, সজাত, সবন্ধু, কুল (পরিবার) প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার দেখে যৌথ পরিবারের ইঙ্গিত মেলে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নববধূর উদ্দেশ্যে বলা মন্ত্রের মধ্য দিয়ে যৌথ পরিবারের চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।। (দত্ত ৫৫৬)।

অর্থাৎ তুমি শ্বশুরের উপরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বাশুড়ীর উপরে সম্রাজ্ঞী হও, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞী হও।
জ্ঞাতি বা আত্মীয়তা ঋক্-বৈদিক যুগের সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি। তখন অতিথিকে আপ্যায়ন করার রেওয়াজও ছিল। অতিথিসেবা সম্পর্কে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে– গৃহাগ্নিকে যেমন সযত্নে রক্ষা ও পরিচর্যা করতে হয় অতিথির প্রতিও সেই একই ব্যবহার করা উচিত।

বিবাহঃ

বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ তাদের বৈবাহিক জীবন শুরু করেন। বর্তমান যুগে যেমন এ প্রথা রয়েছে, হাজার হাজার বছর পূর্বেও সমাজে এ ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক যুগেও বিবাহের প্রচলন ছিল। তবে ঋগ্বেদে বাল্যবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিবাহ প্রথা পবিত্র কাজ হিসেবে বিচার্য ছিল। ঋগ্বেদের বিবাহ সূক্তে (১০/৮৫) বৈদিক যুগের বিবাহ সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এখানে পাত্রপক্ষসহ বরের কন্যাগৃহে আগমন, ভোজসভা, অগ্নি প্রদক্ষিণ, বিবাহকালে পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক হস্তধারণ, স্বামীগৃহে কন্যার শোভাযাত্রা গমন সহ কন্যার পরিচ্ছদের বিশুদ্ধিসাধন বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। বিবাহে কন্যার সাথে উপঢৌকন দেওয়া হতো। ঋগ্বেদের ১০/২৭/১২ মন্ত্রে বলা হয়েছে একজন নারী তার ইচ্ছে অনুসারে পতি নির্বাচন করতে পারেন (যেমনঃ ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যার শরীর সুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে)। এ থেকে বোঝা যায়, সে যুগে স্বয়ম্বর প্রথার প্রচলন ছিল। বহুবিবাহের প্রচলন যে ছিল তা ১০/১৫৯/৩, ৫-৬, ১০/১৪৫/৬ এসব মন্ত্রে তার ইঙ্গিত বা বর্ণনা পাওয়া যায়।
ঋগ্বৈদিক যুগের বিবাহ সম্পর্কে ড. যোগীরাজ বসু বলেন,

> আর্য সমাজে বিবাহ ভগবৎনির্দিষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি বলিয়া বিবেচিত হইত। পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাব, গার্হস্থ্য ও আধ্যাত্মিক কর্মে পরস্পরপরস্পরের প্রতি সহায় এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশের রক্ষণ এই সমস্তই বিবাহ বন্ধনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আর্যগণ যে সর্বদা স্বকীয় ঔরসজাত পুত্রকামনা করিত এবং সেই স্থান যে পোষ্যপুত্রদ্বারা পূরণ হয়না এই তথ্য সপ্তম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে সুব্যক্ত। শক্তিশালী যোদ্ধা পুত্রকামনা করিয়া দেবতাকে স্তুতি করা হইত যে পুত্র যেন আবার সেই একই দেবতাকে তাহার পিতার সহিত যুগ্মভাবে স্তুতি করিতে পারে। পতি কখনও পত্নীর উপর অযথা প্রভাব বিস্তার করিত না বরং জীবনসঙ্গিনী হিসাবে তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিত। সহধর্মিনী শব্দ পত্নীতে সার্থক রূপ পাইয়াছিল। (বসু ২১৯)

শিক্ষাব্যবস্থাঃ

বর্তমান যুগ আর ঋক-বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান সময়ে শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মধ্যে আর্থিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পাঠ দান হয়। কিন্তু সে সময় আচার্যেরা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণ করতেন না। আচার্য শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যিনি বিনামূল্যে শিক্ষাদান করেন। তবে প্রচলিত একটি বিশ্বাস ছিল দক্ষিণাস্বরূপ আচার্যকে কিছু দান না করলে সামান্যতম শিক্ষাও ব্যর্থ হতো। তাই গুরুগৃহ ত্যাগ করার পূর্বে ছাত্ররা সাধ্যানুযায়ী কিছু না কিছু দক্ষিণা দান করতেন। এমনকী সামর্থ না থাকলে অন্তত শাকসবজি গুরুর জন্য রেখে যেতেন। বৈদিক যুগে সব শ্রেণির ছাত্ররা পাঠগ্রহণ করতে পারতেন না। উচ্চশ্রেণি অর্থাৎ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে গুরুর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেত। আর উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক এই দুই ভাগে শিক্ষার্থীরা বিভক্ত ছিল। উপকুর্বাণ শ্রেণি পাঠশেষে পিতৃগৃহে ফিরে যেতেন আর নৈষ্ঠিক শ্রেণি গুরুগৃহে থেকে কৌমার্য গ্রহণ করতেন। সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে পাঠ সমাপ্ত হবার রেওয়াজ ছিল, যা বর্তমান সময়ে বিশ্বাবদ্যালয়গুলোতেও প্রচলিত আছে।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে বলা হয়েছে–

সম্বৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণ্য ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিম্বিতাং প্র মণ্ডুকা অবাদিষু।। (দত্ত ৫৫৬)।

অর্থাৎ সম্বৎসর ব্রতচারী স্তোতাদের ন্যায় সম্বৎসর শয়ান থেকে মণ্ডুকগণ পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করেছেন। বৈদিক যুগে গুরুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুর কাছে শিষ্যরা (শিক্ষার্থী) এসে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। গুরু বেদমন্ত্র আবৃত্তি করলে শিষ্যরা সমস্বরে পুনরাবৃত্তি করতে থাকেতেন–

যদেষামন্যো অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ।
সর্বং তদেষাং সমৃধেব পর্ব যৎসুবাচো বদথনাধ্যস্পু।। (দত্ত ১৮১)।

অর্থাৎ শিষ্য গুরুর ন্যায় যখন এ মণ্ডুক সকলের মধ্যে একটি অন্যের বাক্য অনুসরণ করে তখন হে মণ্ডুকগণ! তোমরা সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হয়ে জলের উপর লম্ফ প্রদান করে শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্বযুক্ত শরীর সমৃদ্ধ হয়।

শিক্ষাবর্ষ শুরু হতো শ্রাবণ মাস থেকে। বেদ-পাঠ শুক্লপক্ষে আর বেদবহির্ভূত বিষয় কৃষ্ণপক্ষে পড়ানো হতো। এই পর্ব সাধারণভাবে সাড়ে চার মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে শেষ করে পৌষের শেষে বা মাঘের শুরুতে উৎসর্গ বা সমাপ্তি অনুষ্ঠান হতো। তবে সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম দ্বাদশ বর্ষের ছিল। শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ করা হতো সমাবর্তনের মাধ্যমে। আর এ অনুষ্ঠানে ছাত্রকে স্নাতক হিসেবে ঘোষণা করা হতো। অনেকে আবার আজীবন ছাত্র থাকতেন বলে তাদের 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' বলা হতো। 'ব্রহ্মচারী' শব্দটি ঋগ্বেদে উল্লেখ রয়েছে–

ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্।
তেন জায়ামন্ববিন্দদ্বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং ন দেবাঃ।। (দত্ত ১৮১)।

সে সময় নারীগণ শিক্ষালাভের অধিকারী ছিলেন। কেননা ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা হিসেবে বিশ্ববারা, অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, অপলা, ঘোষা, বাক্‌সহ অনেক নারীর নাম পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়; যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এবং উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের ১/১১৫/১৫ নং মন্ত্রে বিশ্পলার বীরত্বসূচক বিবরণ, ১০/১০২/২ নং মন্ত্রে মুদ্‌গলানীর বীরত্ব এবং ভীষণ সাহসিকাতার সাথে যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও ৫/৬১, ৫/৮০/৬, ৭/৭৮/৫, ৮/৩৩/১৯, ৮/১১ সহ প্রভৃতি সূক্ত ও মন্ত্রে নারীদের যুদ্ধবিদ্যার দক্ষতা এবং বীরত্বের বর্ণনা রয়েছে।

চতুরাশ্রমঃ

চতুরাশ্রম বলতে জীবনের চারটি আশ্রম যথা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসকে বোঝায়। সংহিতা ও ব্রাহ্মণসাহিত্যে চতুরাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন, এই তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটে ধর্মশাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে। অগস্ত্য ও তাঁর স্ত্রী ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন সম্পর্কে ১/১৭৯ সূক্তে যে আলোচনা আছে তাতে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রমাণ মেলে। ১/১০৯/৩ নং মন্ত্রে পুত্র-পৌত্রাদিরূপ রজ্জু ছেদন না করার প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। একই দৃষ্টান্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদেও রয়েছে। এসবের আলোকে গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রচলন ছিল বলা যায়। এছাড়া আরণ্যকে বাণপ্রস্থ আশ্রমের এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ঋষি যাজ্ঞবল্কের সন্ন্যাস হবার কাহিনির বর্ণনা রয়েছে। ব্রহ্মচর্য হচ্ছে ছাত্রজীবন। আট থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত মোট বারো বছর ব্রহ্মচর্যের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। ব্রহ্মচারী শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করে স্নাতক হওয়ার পর গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেন। জীবিকার প্রয়োজনে নিজবর্ণের উপযোগী বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং বিবাহ করার পর সংসার জীবনের শুরু হয়। এছাড়া দৈনিক গৃহস্থকে ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ– এই পাঁচটি যজ্ঞ করার কথাও

রয়েছে। যজ্ঞ ছাড়াও গার্হস্থ্য আশ্রমে একজন গৃহস্থকে নানাবিধ নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। তৃতীয় আশ্রম হিসেবে রয়েছে বানপ্রস্থ। সংসার জীবন ত্যাগ করে অরণ্যে বাস করাই হচ্ছে বানপ্রস্থ। এসময় একজন বানপ্রস্থী বনজ খাদ্য এবং গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছায় দেয়া খাদ্যদ্রব্য অবলম্বন করেই জীবনধারণ করবেন। সর্বশেষ আশ্রম হচ্ছে সন্ন্যাস। সংসারের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করতে হতো। কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর পুনরায় গার্হস্থ্যজীবনে ফিরে যাবার সুযোগ ছিল যা কিনা বানপ্রস্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সামাজিক আইনকানুন:

আমাদের অনেকের ধারণা বর্তমান সময়ে অনেক কিছু বা সবকিছুই খারাপ এবং পূর্বের সবকিছুই ভালো ছিল। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ তা বলে না। সব যুগেই ভালো-মন্দ বিষয়গুলো ছিল। প্রামাণ্য গ্রন্থ বা ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য যে ঋগ্বেদ সেখানেও দেখা যায় সমাজে সব শ্রেণির মানুষের বসবাস যেমন ছিল, তেমন এখনকার মতো তখনও মন্দ কাজের জন্য শাস্তির বিধান ছিল। সমাজে মন্দ কাজের জন্য নিন্দা করা হতো। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৪ নং অক্ষ সূক্তে অক্ষ বা পাশা খেলার ভয়বহতা এবং এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। পাশা খেলার নেশার সাথে ভ্রষ্ট নারীর উপপতির কাছে অভিসারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সমাজে এসব মানুষকে কতটা নিন্দা সহ্য করতে হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। অক্ষ বা পাশা খেলাকে নিন্দনীয় কাজ উল্লেখ করে এর পরিবর্তে বরং কৃষিকাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন:

> অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
> তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ।। (দত্ত ৫০১)।

অর্থাৎ হে দ্যূতকার! পাশা কখনো খেলো না, বরং কৃষিকাজ কর। তাতে যা লাভ হয় সে লাভে সন্তুষ্ট হও, ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করো। তাতে পত্নী ও অনেক গাভী পাবে। এ যে সূর্যদেব, ইনি আমাকে এ বলে দিয়েছে। ঋক্-বৈদিক যুগে আইন বলতে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ সময় চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও প্রতারণাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধের জন্য সাধারণ শাস্তির পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের রীতি থাকলেও প্রাণদণ্ডের বিধান ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না।

বৈদিক পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থা উন্নত হয়। এ সময় আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং বিচারের দায়িত্ব রাজার উপর ন্যাস্ত ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫/৪/৪/৭) বলা হয়েছে রাজা দণ্ড পরিচালনা করেন কিন্তু তিনি নিজে দণ্ডের অধীন নন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের পাশাপাশি পরবর্তীকালে ধর্মসূত্রসমূহে প্রথম ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক আইনকানুন লিপিবদ্ধ হয়। এ সময়ের আইনের উৎস তিনটি, যথা– ১. বেদ, ২. ঐতিহ্য (স্মৃতি) ও ৩. বিচার বুদ্ধি। ধর্মসূত্রানুযায়ী চুরি, ব্যভিচার এবং আঘাত করার অপরাধকে ফৌজদারি বিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে (৬/২৭) ভ্রূণহত্যাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতাধীন করেছেন। বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রের মতে, আত্মরক্ষার জন্য কেউকে নিহত করা অপরাধ নয়। আবার আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১/৯/২৫/১-২) ব্যাভিচারের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে।

খাদ্য ও পানীয়:

আমরা সবসময় শুনে থাকি পূর্বে গোলা ভরা ধান ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল অর্থাৎ সবকিছু কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। অথচ সাহিত্যে অবলোকন করলে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে খাদ্যসংকট সর্বকালের সাধারণ সমস্যা; গোলা ভরা ধান বা পুকুর ভরা মাছ কেবল রূপক মাত্র । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ অনেকের রচনায় যেমন সে সময়ে খাদ্যসংকট,

ক্ষুধার তীব্রতার ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে ঠিক তেমনি ঋক-বৈদিক যুগেও খাদ্যের ঘাটতি, দরিদ্রতা ছিল তা ঋগ্বেদে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে অন্নের চৌদ্দটি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলোঃ অন্ন, অন্ধস্, ইষ, বাজ, পৃক্ষ, পিতু, ভক্ত, শ্রবস্, স্বধা, ঊর্জ, ইলা, চন, নমস্ ও বয়স্। অন্নের গুরুত্ব অত্যধিক ছিল বলেই এত নাম ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। খাদ্যের প্রার্থনা ও অভাব সম্পর্কে ঋগ্বেদে সর্বাধিক সূক্তে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতিনির্ভর প্রধান প্রধান দেবতা ছাড়াও অন্নের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। যেমনঃ অগ্নি (১/৩৬/২), ইন্দ্র (১/৬৩/৮), (১/৫৩৫), ইন্দ্র ও অগ্নি (৩/১২/৫), ঊষা (১/৪৮/১২), অশ্বিদ্বয় (১/৪৭/৮), (১/১৫৭/৪), (১/৪৮/১৬); এছাড়াও (২/১/৬), (২/১৫/৮), (২/৩১/৩), (২/৩২/৭), (২/৩৪/৬), (৫/৬/২,৩), (৫/৯/৭), (৫/১০/১), (৫/৩৯/৩), (৫/৪৪/১০), (৫/৭০/২), (৬/৮/১), (৬/২৬/২), (৬/১১/৬), (৬/১৭/২), (৬/২৬/২) (৬/৪৭,৯), (৬/৬৩/৭), (৭/৭/৭), (৭/২৬/৫), (৮/১/৪) সহ আরো বহু মন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

ঋক্-বৈদিক যুগে খাদ্য সঙ্কট নিরসনে প্রার্থনা দ্বারা যখন আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না তখন যজ্ঞেরও ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন–

> মানুষের প্রয়োজন ও প্রার্থনা এবং দেবতাদের অনুগ্রহ– এর মধ্যে সেতুরচনা করে যজ্ঞ মানুষের হবির্দান ও স্তুতি বহন করে দেবতাদের কাছে নিয়ে যায়, যাতে তাঁরা করুণাপরবশ হয়ে ক্ষুধিতকে খাদ্য দান করেন। যজ্ঞ, যা আদিমতম ধর্মানুষ্ঠান, তার একটা প্রধান ভিত্তিই হলো অন্নের ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব। বলাবাহুল্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রার্থনা যেহেতু অন্নের জন্যেই, তাই সহজেই বোঝা যায়, এই প্রাথমিক প্রয়োজনই ছিল যজ্ঞকর্মের মূল প্রবর্তনা। (ভট্টাচার্য ২৯)

ঋক্-বৈদিগ যুগে খাদ্যাভ্যাস ছিল সাধারণ ও অনাড়ম্বর। এ সময়ের প্রধান আহার্য ছিল দুধ, ঘি, শস্য (যব), দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফলমূল, শাকসবজি এবং মাংস। ঋগ্বেদে ব্রীহি বা ধানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অথর্ববেদে ধানসহ যব, মাষ ও তিলের উল্লেখ রয়েছে– 'ব্রীহিমত্তং যবমত্তমথো মাষমথো তিলম্'। খাদ্য হিসেবে এ সময়ে মাংসের বহুল প্রচলন ছিল। যজ্ঞে মাংসের আহুতি দেয়া হতো। পশুযাগ নামক যজ্ঞে ছাগ এবং অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞে বন্ধ্যা গাভী বা ষাঁড় বধ করা হতো। মধ্য বৈদিক এবং উত্তর বৈদিক যুগে খাদ্য হিসেবে গোমাংসের (১০/৮৯/১৪) প্রচলন শুরু হয়েছিল। এর পাশাপাশি অশ্বের মাংস খাওয়া হতো (১/১৬২/১১-১৩)। পরবর্তীকালে গাঙ্গেয় উপত্যকার উষ্ণ পরিবেশে বাস করতে শুরু করলে আর্যদের গোমাংস আহার বন্ধ হতে থাকে। এমনকী গোমাংস বধে ধর্মীয় বাধা-নিষেধও আরোপিত হয়। ঋগ্বেদে সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল বটে তথাপি বিভিন্ন উৎসবে সোমরস পান করা হতো। এছাড়াও পানীয় হিসেবে মধু পানও করা হতো।

খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদঃ

বৈদিক যুগে ঘোড়াদৌড় খুব জনপ্রিয় ছিল। বাজপেয়, রাজসূয় নামক প্রভৃতি যজ্ঞেও এই দৌড় অনুষ্ঠিত হতো। অক্ষ বা পাশাখেলাও সে সময়ের জনপ্রিয় খেলা ছিল। তবে নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচিত হতো। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয় সংহিতায় বংশনর্তী নামক এক জাতির উল্লেখ রয়েছে যাদের জীবিকা ছিল দৈহিক ক্ষিপ্রতামূলক ক্রীড়া প্রদর্শন।

পোশাক ও অলঙ্করণঃ

বৈদিক যুগে পোশাক তৈরির জন্য উপকরণ হিসেবে তুলো এবং পশমের পাশাপাশি রেশমেরও ব্যবহার হতো। বৈদিক সংহিতা এবং ব্রাহ্মণসাহিত্যে 'ঊর্ণাসূত্র' শব্দটি পাওয়া যায়। 'ঊর্ণ' বলতে মেষ বা ছাগলের লোম বোঝায়। ঋগ্বৈদিক যুগে তিন ধরনের পোশাক পরিধান করত। নিম্নাঙ্গের জন্য 'বাস', ঊর্ধ্বাঙ্গে 'অধিবাস' এবং 'অধিবাস' এর

সঙ্গে 'নীবি' বা 'অন্তর্বাসের' প্রচলন ছিল। বৈদিক যুগে আবরণীয়কে অত্‌ক এবং দ্রাপি বলা হতো। উভয়েই সোনা ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্কার পরিধান করতেন। উপানঃ বা পাদুকা এবং উষ্ণীষ (মস্তকাবরণ)-এর ব্যবহার ব্রাহ্মণসাহিত্যে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চামড়ার তৈরি জুতার কথাও জানা যায়। চন্দন অনুলেপন হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

শিল্প নির্মাণঃ

বর্তমান যুগে বসবাস করে নিজেদেরকে আধুনিক দাবি করে আমরা খুব গর্বিত হই। অথচ সাহিত্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত জানান দেয় যে বর্তমানে আমাদের যে শিল্পসমূহ, তার অধিকাংশই পূর্বকাল হতেই ছিল। যেমনঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, চর্ম, রজ্জু, বয়ন শিল্পসহ স্থপতি বিদ্যার ব্যবহার ছিল ঋক্-বৈদিক যুগে। বহু মন্ত্রে ইন্দ্রের স্বর্ণনির্মিত বজ্রের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া স্বর্ণ দ্বারা অস্ত্রনির্মাণ, অলঙ্কারের ব্যবহার, এমনকি সোনার তৈরি রথনির্মাণেরও উল্লেখ রয়েছে। রথের উল্লেখ করে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে–

সনাৎসনীলা অবনীরবাতা ব্রতা রক্ষন্তে অমৃতাঃ সহোভিঃ।
পুরু সহস্রা জনয়ো ন পত্নীদুর্বস্যন্তি স্বসারো অহয়াণম্।। (দত্ত ১৬১)।

অর্থাৎ হে ইন্দ্র! তুমি সকলের আদি; হে সুনেত্র বলবান ইন্দ্র! তুমি রথে অশ্ব যোজনা কর; গৌতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের নিমিত্ত তোমার এ নতুন স্তোত্র রচনা করেছেন। অতএব যিনি কর্ম দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়েছেন, সে ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।

বৈদিক যুগে নারীঃ

বৈদিক যুগের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে পুরুষদের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। কেবল গৃহস্থালী কাজকর্ম, সূচশিল্পে দক্ষতা নয়; বরং শিক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্র, জোতির্বিদ্যা সহ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের দক্ষতা, পারদর্শিতার প্রমাণ মেলে।

পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উপনয়ন হতো। তাঁরা উপবীত ধারণ করতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য– এই তিন বর্ণের পাশাপাশি বেদপাঠে নারীও অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া অথর্ববেদে নারীদের ক্ষেত্রে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের পূর্বে কঠোর অনুশীলনের দ্বারা ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলা হয়েছে। সেসময় বিদুষী নারীরা হলেন– লোমশা (১/১২৬), লোপমুদ্রা (১/১৭৯), অম্ভৃণী বাক্ (১০/১২৫) প্রমুখ। এছাড়া নারী ঋষি হচ্ছেন– ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের ঋষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা, ৫ম মণ্ডলের ২৮ নং সূক্তের ঋষি অত্রি কন্যা বিশ্ববারা, ৮ম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তের ঋষি অপালা, ১০ মণ্ডলের ৩৯-৪০ সূক্তের ঋষি ঘোষা, ৮৫ সূক্তের ঋষি সূর্যা, ১২৫ সূক্তের ঋষি অম্ভৃণ কন্যা বাক্ এবং ১৪৫ সূক্তের ঋষি ইন্দ্রাণী প্রভৃতি।

বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বাল্যবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। গৃহ্যসূত্রগুলোতে বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীর আনুষ্ঠানিক মিলনের কথা থাকায় ধরা যায় সেসময় নাবালিকার বিয়ে হতো না। গৃহ্যসূত্র মতে, পাত্র-পাত্রীর সমগোত্রে বিয়ে হতো না। বিবাহের প্রথম দিবসে পাত্রীকে স্নান করানো হতো। এরপর সংক্ষিপ্ত যজ্ঞকার্যের পর 'ইন্দ্রাণীকর্ম' নামে অনুষ্ঠান হতো যেখানে কয়েকজন নারী নৃত্যগীত দ্বারা কন্যাকে বরণ করে নিতেন। এরপর বরপক্ষ উপহারসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হলে কন্যা প্রদান অনুষ্ঠান এবং তারপর পাণিগ্রহণ পর্ব। উভয়ে এরপর অগ্নি সন্নিধানে গিয়ে বাকি আনুষ্ঠানিকতা শেষে সপ্তপদী গমন হতো।

বৈদিক যুগে নারীদের বহুবিবাহের উল্লেখ নেই যদিও পুরুষের ক্ষেত্রে এ প্রথার প্রচলন ছিল। এ যুগে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল না। তবে বিধাবা বিবাহের কথা জানা যায়–

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।। (দত্ত ৪৬২)।

অর্থাৎ হে নারি! সংসারের দিকে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন, সে পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হয়েছে।

রাজনীতিঃ

ঋক্‌-বৈদিক যুগের সমাজে রাষ্ট্র বিষয়ক সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালীন আর্য তথা উপজাতিদের মধ্যে সভা অর্থাৎ কৌমসমাজের প্রচলন ছিল। এখানে জনসমষ্টির প্রধানকে বলা হতো রাজন্‌ বা রাজা। রাজাকে সেনানী বা ব্রাতও বলা হতো। এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ‘অক্ষ’ সূক্তে বলা হয়েছে–

যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি।। (দত্ত ৪৮৫-৪৮৬)।

অর্থাৎ হে পাশাগণ! যে তোমাদের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনাপতি ও রাজার তুল্য, আমি তাঁর প্রতি আমার এ দশ আঙ্গুলি একত্র করে প্রণাম করছি, আমি তোমাদের কাছে অর্থ চাই না, এ সত্য করে বলছি।

রাজা শব্দের ব্যবহার ৭/১৮/২ (রাজেব হি জনিভিঃ), ৭/৩৩/৩ (দাশরাজ্ঞে), ৭/৮৩/৬ (দশ রাজানঃ), ৪/৫০/৮ (ব্রহ্মা রাজনি) সহ প্রভৃতি মন্ত্রে পাওয়া যায়। আবার এসব মন্ত্রে রাজার যুদ্ধ, রাজ্যশাসনপ্রণালী, ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে ধারণা মেলে। এসময় থেকেই রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেন। বৃহস্পতি সূক্তে রাজার নিকট ব্রাহ্মণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে–

স ইদ্রাজা প্রতিজন্যানি বিশ্বা শুষ্মেণ তস্থাবভি বীর্যেণ।
বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্তি বল্গূয়তি বন্দতে পূর্বভাজম্‌।।
স ইৎক্ষেতি সুধিত ওকসি স্বে তস্মা ইলা পিন্বতে বিশ্বদানীম্‌।
তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবা নমন্তে যস্মিন্‌ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি।। (দত্ত ৫২৫-৫২৬)।

অর্থাৎ যিনি বৃহস্পতিকে সুন্দররূপে পোষণ করেন এবং তাঁকে প্রথম হব্যগ্রাহী বলে স্তুতি করেন ও নমস্কার করেন, সে রাজা স্বীয় বীর্য দ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করে অবস্থিত করেন। যে রাজার নিকট ব্রহ্মা প্রথম গমন করেন, তিনি সুতৃপ্ত হয়ে স্বকীয় গৃহে বাস করেন। পৃথিবী তার জন্য সর্বকালে ফল প্রসব করেন, প্রজাগণ নিজেরাই তার নিকট প্রণত থাকে।

তবে কৌমসমাজের রাজা ঠিক রাজতন্ত্রের রাজা নয়; মূলত সভা বা সমিতিতে উপস্থিতিদের মধ্যে প্রধান। ধীরে ধীরে কৌমসমাজ থেকে রাজতন্ত্রের রাজা সৃষ্টি হয়। আর রাষ্ট্রব্যবস্থার এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামরিক নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কাঠক সংহিতার ৯/১৭, তৈত্তিরীয় সংহিতার ৬/৪/৮/৩, শতপথ ব্রাহ্মণের ২/৪/৬/২ প্রভৃতির আলোকে বলা যায়, যুদ্ধবিগ্রহই রাজার প্রধান কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। তিনি জনগণের রক্ষক, গোপা জনস্য। তিনি জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। রাজা প্রয়োজনানুসারে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করতে পারতেন। আর রাজা নির্ধারিত হতেন বংশানুক্রমে। তবে কাঠক সংহিতা ২৭/১, তৈত্তিরীয় সংহিতা ২/৩/১, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের

১২/১২/৬, শতপথ ব্রাহ্মণের ১২/৯/৩/১ অনুযায়ী অত্যাচারী ও নিপীড়িত রাজাকে বিতাড়িত করার উদাহরণও রয়েছে।

পরবর্তীকালে অনার্যদের পশু হরণ করে নিজেদের পশুপালননির্ভর অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে আর্য সম্প্রদায় যুদ্ধপরায়ণ হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ক্ষমতার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে।

অর্থনীতি:

ঋক্-বৈদিক যুগের শুরুর দিকে আর্যরা পশুশিকার করতেন। তবে ধীরে ধীরে তাঁরা পশু পালন করতে থাকেন এবং এর সুবিধা বুঝতে পেয়ে পশুপালনের ক্ষেত্রে আগ্রহী হন। আর এভাবে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে পশুপালন। বৈদিক সাহিত্যের আলোকে বলা যায়, সে সময়ের গোষ্ঠীভিত্তিক কৌমসমাজের মূল সম্পদই ছিল পালিত পশু (অশ্ব, গাভী ও বলদ প্রভৃতি)। ঋগ্বেদে 'গো' শব্দের সমার্থক শব্দ রয়ি। যে ব্যক্তি এই গো সম্পদের অধিকারী ছিলেন তাকে গোমৎ বলা হতো। বৈদিক যুগে এই গো-সম্পদ নিয়ে কৌমসমাজে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকতো। গবাদি পশু নিয়ে এই যুদ্ধকে বলা হতো 'গবিষ্টি'। ঋগ্বৈদিক যুগে গো-সম্পদের পাশাপাশি অশ্বেরও বেশ গুরুত্ব ছিল। ১/৯/৭, ১/৯২/৭১, ১/১৬২/৩, ১/১৬৪/৪৩, ৪/২/৫, ৪/৫৭/৮, ৭/৬২/৫, ৮/৫/৩৭, ৮/৬/৪৭-৪৮, ১০/৯/৮, ১০/২৬/৬, ১০/৮৬/14 মন্ত্রে গরু, অশ্ব, মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতি গবাদি পশুর উল্লেখ, পালন, দান, প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বৈদিক যুগে আর্যদের যেহেতু পশুপালন প্রধান জীবিকা ছিল। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই পশু সংগ্রহ করতে তাঁদের বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হতো। সেসময়ে অনেকের হয়তো দস্যুদলের আক্রমণের স্বীকারও হতে হতো। আর এই প্রতিবন্ধকতা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রার্থনা করা হতো–

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।
অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।। (দত্ত ১৩৪)।

অর্থাৎ বিঘ্নকারী শত্রুদের অতিক্রম থেকে আমাদের নিয়ে যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদের নিয়ে যাও; হে পূষা! তুমি এ পথে আমাদের রক্ষণের উপায় কর। শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদের নিয়ে যাও, পথে যেন নতুন সন্তাপ না হয়। হে পূষা! তুমি এ পথে আমাদের রক্ষণের উপায় কর।

এরপর আর্যরা যখন কৃষিকাজ সম্পর্কে জানতে শুরু করেন তখন খাদ্যসংকট দূরীকরণে কৃষির প্রতি আগ্রহী হয় এবং পরবর্তীকালে প্রধান জীবিকা হয় কৃষিকাজ। ব্রীহি ও যব নানাবিধ শস্যের বিবরণ সংহিতায় পাওয়া যায়। এ সময় কৃষককে কৃষ্টি বলা হতো। ঋগ্বেদে কৃত্রিম জলসেচের বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, ধীরে ধীরে কৃষিকাজে আর্যরা বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। যেমন–

যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু।। (দত্ত ১৫৩)।

অর্থাৎ যে অপসমূহ অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যা প্রবাহিত হয়ে খনন দ্বারা যাদের লাভ করা যায়, যা স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সে অপদেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন। এখানে 'খনিত্রিমা' শব্দে কৃত্রিম জলসেচ প্রথা ও 'স্বয়ংজাঃ' শব্দে প্রাকৃতিক জলসেচকে বোঝানো হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে দুটো অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে শুন (লাঙ্গল) এবং সীতা (লাঙ্গলের ফলা)। তাছাড়া পাকা ফসল কাটতে ব্যবহার করা হতো দাত্র বা সৃণী (দা বা কাস্তে জাতীয় উপকরণ)। কৃষিকাজে ব্যবহৃত হতো কোদাল। তবে তা

ধাতু বা লোহার তৈরি নয়; বরং পাথর ঘসে সরু করে ধারালো কোদাল তৈরি করা হতো এবং তা কাঠের হাতলের সাথে সংযুক্ত করে পাথরখণ্ড বেঁধে দিয়ে কৃষিকাজ করা হতো।

কৃষিকাজের সঙ্গে তৎকালীন শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে দারুশিল্প। আর এই শিল্পের সাথে জড়িত ছিল তিন ধরনের লোক; যথা– ১. কাঠুরে, ২. তক্ষক ও ৩. রথকার। দারুশিল্পের পাশাপাশি বয়ন শিল্প, ধাতু শিল্প, মৃৎ শিল্পেরও পরিচয় মেলে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে ছুতোর, রথনির্মাতা, তাঁতি, চর্মকার ও মৃৎশিল্পী প্রমুখ কারিগরের উল্লেখ আছে। আর ধারণা করা হয় তখন এসব শিল্পে তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। 'অয়স' শব্দটি এখানে তামা বা ব্রোঞ্চ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে মনে হয় তখনকার সময়ে ধাতব শিল্পের সাথে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। ১/৬২/১৩ মন্ত্রে রথাকার, ৫/৯/৫, ৬/৪৭/২৭, ৬/৪৮/১৮ মন্ত্রে চর্মশিল্প ও চর্মকারের, ১/১১৬/১৫ মন্ত্রে অস্ত্রপাচারে লৌহনির্মিত জঙ্ঘা ব্যবহার, ৭/৩৩/৯ মন্ত্রে বয়ন শিল্পের, ১০/৭১/৯, ৬/৪৬/৯ মন্ত্রে ত্রিধাতু গৃহ, ৮/১০০/৮ মন্ত্রে প্রস্তরনির্মিত নগর ও গৃহনির্মাণের উল্লেখ আছে।

বিনিময় প্রথা ঋগ্বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। বিনিময় দ্রব্য হিসেবে গোধন ব্যবহৃত হতো। তবে পরবর্তীকালে গোধনের পাশাপাশি ব্রীহি পরিমাপক হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল। এ যুগের অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রচলন ছিল না।

ধর্ম:

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলো থেকে আর্যদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা। প্রতিটি মন্ত্রই এক এক দেবতার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। 'দেবতা' শব্দটি এসেছে *দিব্* ধাতু থেকে। দিব্+অচ্= দেবঃ, দেব+তল্= দেবতা। বেদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিটি মণ্ডলে পরিবর্তিত হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এসে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে যা পূর্বের মণ্ডলে অনুপস্থিত। প্রথম দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়েছে তখন তাঁকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ যুগে মানুষ প্রকৃতির প্রতিটি সত্ত্বার উপরই কোনো না কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছে। তবে বহু দেবতার বিশ্বাস একত্রীভূত হয়েছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে–

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে।। (দত্ত ৬২০)।

অর্থাৎ (বাগ্দেবীর উক্তি) আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হন, আমিই তাঁকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করে দেবতাদের উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাকে ধন দান করি।

নিরুক্তকার যাস্ক বেদের দেবতাগণের স্থান ভেদে তিন ভাগে ভাগ করেছেন–

১. ভূলোকের দেবতা (অগ্নি, অপ্ বা জল, পৃথিবী এবং সোম)
২. অন্তরীক্ষের দেবতা (ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, পর্জন্য প্রমুখ)
৩. দ্যুলোকের দেবতা (বরুণ, সূর্য, মিত্র, আদিত্য, ঊষা, রাত্রি প্রমুখ)

এক্ষেত্রে ভূলোকের প্রধান দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতা ইন্দ্র বা বায়ু এবং দ্যুলোকের প্রধান দেবতা হলো সূর্য। যাস্ক এ সম্পর্কে বলেছেন–

ত্রিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ
পৃথিবী-স্থানো বায়ুরিন্দ্রো
বাহন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুঃস্থানঃ।। (দত্ত ৫৪-৫৫)।

অর্থাৎ নৈরুক্তে তিনটাই দেবতা। অগ্নি পৃথিবীস্থানী, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষস্থানী আর সূর্য দ্যুস্থানী।
ভূলোকের দেবতা অগ্নি। ঋগ্বেদের সূচনা ও সমাপ্তি অগ্নির বন্দনা দিয়ে। তিনি দূত হয়ে যজ্ঞে সকল দেবতাদের আহ্বান করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে অর্ঘ্য ও আহুতি দেন। অগ্নি সংযোগের দ্বারা আর্যরা ঊষর ভূমিকে কৃষির উপযোগী করতেন বলে অগ্নিকে তারা ধনদাতা দেবতা বলে ভাবতেন।

ভূলোকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হচ্ছেন সোম। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের প্রধান এবং একমাত্র দেবতা সোম। মূলত সোম হচ্ছেন উদ্ভিজ্জ শ্রেণির একজাতীয় উত্তেজক রস যা আর্যদের কাছে খুব প্রিয় ছিল। এ সোমরস পানে তৃপ্তি ও উন্মাদনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দেবত্ব আরোপিত হয়, এমনটাই তাঁদের বিশ্বাস ছিল। নবম মণ্ডলের সব সূক্ত সহ মোট ১২০টি সূক্ত সোমলতাকেন্দ্রিক।

ঋগ্বেদে সৌরদেবগণের বন্দনা রয়েছে। এসব দেবগণ ধীশক্তির প্রেরণকারী এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের মোচনকারী। দ্যুলোকের প্রধান দেবতা হলেন সূর্য। সৌরদেবতার আদিমাতা হিসেবে পরিচিত অদিতি। ধাতা ও বিবস্বান্ হচ্ছেন সৌরদেবতার সৃজনশীল দিক এবং জ্যোতিষ্করূপে প্রকাশের প্রতীক। দ্যুলোকের অন্যতম জনপ্রিয় দেবতা ঊষা যিনি তারুণ্যের প্রতীক। ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৬১ নং সূক্ত ঊষা দেবীর বন্দনা করা হয়েছে। এছাড়াও ১/৯২/৭, ১/৯২/১১, ১/১১৩/৭, ১/১১৩/১৬, ১/১২৪/৪, ৫/৮০/৩-এ এ দেবীকে নানারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সুন্দরী, সজীব ও চিরতরুণী রূপে তাঁর স্তুতি করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

ঊষো বাজেন বাজিনি প্রচেতাঃ স্তোমং জুষস্ব গুণতো মঘোনি।
পূরাণী দেবি যুবতিঃ পুরন্ধিরনু ব্রতঃ চরসি বিশ্ববারে।। (দত্ত ৪৬২)।

অর্থাৎ হে অন্নবতী ধনবতী ঊষা! আমি স্তব করেছি, তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী হয়ে আমার স্তোত্র গ্রহণ করো। হে সকলের বরণীয়া পুরাতনী যুবতীর ন্যায় শোভমানা ও বহুস্তোত্রবতী ঊষা! তুমি যজ্ঞকর্মাভিমুখে এসা।

যমজ দেবতা অশ্বিদ্বয় বিভিন্ন সংকট, অসুস্থতা, অগ্নিকাণ্ড ও জলনিমজ্জন- এর মতো বিপদে প্রত্যক্ষ হয়ে মানুষের সহয়তা করেন এমনভাবেই তাঁদের বন্দনা করা হয়েছে। অশ্বিদ্বয়ের বর্ণনা প্রায় পঞ্চাশের মতো সূক্তে রয়েছে। যেমন: ১/৩৪/৫, ১/৪৬/১৪১, ১/১১৬/১০, ১/১১৬/১৬, ১/১১৯/৫, ১/১৫৭/৬, ৫/৭৫/৯, ৫/৭৩/৫ সহ প্রভৃতি। দশম মণ্ডলের ৮৫ নং সূক্তে অশ্বিদয় এবং সূর্যার বিবাহের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্র হচ্ছেন বীরত্বের দেবতা। তাঁর সহায়ক দেবতা বায়ুবাতঃ, পর্জন্য, রুদ্র ও মরুৎগণ। বীরত্বের জন্য তাঁদের সকলের বন্দনা বারংবার করা হয়েছে। ২/১২/৪, ৩/৩৪/৯, ৪/১৬/১৩, ৪/২৬/৩ এগুলো সহ প্রায় এক-চতুর্থাংশেরও বেশি সূক্তে ইন্দ্র দেবতার বন্দনা রয়েছে। তিনি গোসম্পদ এবং খাদ্যের যোগান দেন। লৌহনির্মিত বজ্র তাঁর অস্ত্র। যুদ্ধবিহগ্রে তিনি সর্বদা জয় লাভ করেন। ইন্দ্রের স্তুতিতে বলা হয়েছে–

ভিনদ্গিরিং শবসা বজ্রমিষ্ণন্নাবিষ্কৃণ্বানঃ সহসান ওজঃ।
বধীদৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানঃ সরন্নাপো জবসা হতবৃষ্ণীঃ।। (দত্ত ৪৮৮)।

অর্থাৎ শত্রুদের অভিভবকর ইন্দ্র তেজ ও বজ্র প্রেরণ করে বল দ্বারা পর্বতসমূহকে বিদীর্ণ করেছিলেন। তিনি হৃষ্ট হয়ে বজ্র দ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করেছিলেন এবং বৃত্র হত হলে জল বেগে গমন করতে লাগলেন।

এ যুগের আর্যদের ধর্মীয় অনুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান। এর ফলশ্রুতিতে পুরোহিতদের গুরুত্ব বেড়ে যায় তৎকালীন সমাজে। যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়– এমন অলৌকিক ধারণা পোষণ করতেন তাঁরা। দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হতো। রাজতন্ত্রের আমলে এসব যজ্ঞে রাজারা প্রচুর ব্যয় করতেন। আর এসব যজ্ঞ সম্পাদন করতে দক্ষ পুরোহিত প্রয়োজন হতো। যজ্ঞে 'বলি' প্রথাও চালু ছিল। তবে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার পর কৃষিকাজের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে এ প্রথার প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে।

ঋগ্বেদের ধর্মবোধ দেবতাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বৈদিক পরবর্তী যুগে ধর্মীয় চেতনার ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। ঋগ্বৈদিক যুগের দেবতারা নতুনরূপে আবির্ভূত হন। নতুন দেবতাদের মধ্যে প্রজাপতি, মীতুষী, জয়ন্ত, কুবের, বৈশ্রবণ, দণ্ডী, গরুর, কন্যাকুমারী, নারায়ণ, বাসুদেব, উমা এবং হৈমবতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ যুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ছিলেন সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। জগতের স্রষ্টা তিনি। বৈদিক যুগের একেশ্বরবাদ পরবর্তী বৈদিক যুগে আরো জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রজাপতি ব্রহ্মা এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আর ইন্দ্র, রুদ্র, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর প্রজাপতির বিভিন্ন রূপ।

ঋগ-বৈদিক যুগে আর্যরা দেবশক্তির উপর নির্ভর করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। ঋগ্বেদে দেবতা ও মানুষের ধৈর্য, ঋজুতা, সহযোগিতা, অতিথিপরায়ণতা, দান– এসবের স্তুতি করা হয়েছে। এসব গুণের কারণেই অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনৌদের বারংবার প্রশংসা করা হয়েছে। বিরুদ্ধ পরিবেশের সাথে জীবনকে সমন্বয় করতে যেমন সহায়তা করেছেন আবার খাদ্যসংকট সহ প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন এসব দেবতা। ঋগ্বেদের ধর্মীয় নীতিবোধ সম্পর্কে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন–

> ঋগ্বেদের নীতিবোধের প্রেরণা হচ্ছে জীবন অমূল্য এবং মূলত কল্যাণময়, মধুর, উপভোগ্য বলেই এই আশ্চর্য রহস্যময় জীবনকে যতদিন পর্যন্ত সম্ভব উপভোগ করাই বাঞ্ছনীয় (ভট্টাচার্য, ৭০)।

পরিশেষে বলা যায়, ঋগ্বেদ কেবল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নয়; মূল্যবান সাহিত্যভাণ্ডারও বটে। এ গ্রন্থের আলোকে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বসবাস করেও সে যুগের জীবনধারা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম সহ যাবতীয় বিষয়ে অবলোকন করতে পারি। ঋক-বৈদিক যুগে কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থাকলেও নানাপেশার মানুষের বসবাস ছিল। সমাজে ধনী-গরীব বিভিন্ন শ্রেণি বিদ্যমান। বিবাহ ছিল পরিবার গঠনের ভিত্তি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হওয়া সত্ত্বেও নারীদের শিক্ষা, বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকা, পরিবারে শক্ত অবস্থান অন্য যেকোনো সময়ের চাইতে উন্মুক্ত ছিল। ধর্মীয় আরাধনা ছিল মূলত প্রকৃতি ও যজ্ঞনির্ভর। জীবনধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে যেমন: অশ্ব ও গোধন লাভ, খাদ্য সংকট থেকে মুক্তি লাভ, সুখ-সমৃদ্ধি সহ প্রভৃতি কারণে তখনকার মানুষ ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ঊষা সহ প্রভৃতি দেবতার স্তুতি করতেন। আমোদের মাধ্যম ছিল অক্ষ খেলা। তবে তা সমাজে নিন্দনীয় বলেই বিবেচিত হতো। তৎকালীন যুগের সমাজজীবনের নানাবিধ চিত্র এবং অধ্যাত্মবিষয়ক চিন্তা-চেতনা কালক্রমে নানা মাত্রায় পরিবর্তন, পরিমার্জন হয়ে আজও বর্তমান যুগে প্রভাব বিস্তার করছে। আমরা আজ যে অবস্থায় আছি তার অন্তরালে এই প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থের অবদান রয়েছে। যুগের পর যুগ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান যুগের। ঋক্-বৈদিক যুগের জীবনচর্চা দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়, নানাবিধ প্রতিকূলতা কাটিয়ে তারা সামনে এগিয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছিন্ন। আলোচ্য প্রবন্ধ সেই পূর্বের সময়টিকে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

তথ্যসূত্র

দত্ত, রমেশচন্দ্র, সম্পাদিত। *ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড)*। হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৭।

দত্ত, রমেশচন্দ্র, সম্পাদিত। *ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় ভাগ)*। হরফ প্রকাশনী, ২০০০।

বসু, ড. যোগীরাজ, সম্পাদিত। *বেদের পরিচয়*। ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, সম্পাদিত। *বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ*। গাঙচিল, ২০০২।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, সম্পাদিত। *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৬০।

শর্মা, রামশরণ, অনূদিত। *ভারতের প্রাচীন অতীত*। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১।